ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 06. No. 01. December 2011

আরব বিশ্বে সাম্প্রতিক সংকট: পরিপ্রেক্ষিত ও প্রকৃতি

শাহনাজ সুলতানা*

Abstract: The recent crisis that has started at the beginning of 2011 in the different Arab countries is an important phenomenon in the history of the Arab Middle East. It is to be noted that till end of the World War I the whole of the Arab Middle East was under the control of Ottoman Empire. But after the war, almost all parts of the Arab World came under European domination. The European countries especially Britain established and patronized kingship in Iraq, while France introduced colonial type of rule in Syria and Lebanon. But the endeavours for introducing parliamentary system failed to a great extent because of the fact that politics was controlled and moulded by the feaudal lords as well as by traditional political parties. Their failure to fulfill the national interests led to the army involvement in Arab politics. The western world favoured both monarchical and military rule for the safety of its own interests. With the pasage of time a neo-middle class emerged in different Arab countries and they put emphasis on overthrowing both types of existing rule. At the same time, to ensure parity in the society they rather choose democratic administrative system. As a result, the situation has changed to a great extent, and crisis has been running in the different Arab countries of the Middle East over the cause of fulfilling their national interests. But it is difficult to comment in advance on the future situation of the running present-day crisis of the Arab World. The present paper seeks to explain the perspective and subsequent impact of the recent crisis.

১

সাধারণভাবে কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, পারস্য উপসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত মুসলিম ও আরব অধ্যুষিত অঞ্চলকে মধ্যপ্রাচ্য বলা হয়। অন্য কথায় আরব লীগের সকল সদস্যদেশ এবং তিনটি অনারব দেশ - তুরস্ক, ইরান ও ইসরায়েল এর সমন্বয়ে বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য। স্বভাবতই মধ্যপ্রাচ্য দু'ভাগে বিভক্ত -

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

আরব মধ্যপ্রাচ্য ও অনারব মধ্যপ্রাচ্য। আর আরবী ভাষাভাষি অঞ্চলের সমন্বয়ে যে বিশ্ব তা আরব বিশ্ব। এর বিস্তৃতি এশিয়া ও আফ্রিকা (উত্তর আফ্রিকা) মহাদেশ জুড়ে। চলতি বছরের শুরুতে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বৈরতন্ত্র বিরোধী গণআন্দোলন শুরু হয়। এ গণজাগরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে।

ওসমানীয়া শাসনামলে উনিশ শতকের সপ্তম দশকে ভৌগোলিক সিরিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ আরব মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমত লেবাননের আরব খ্রীষ্টানরা এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। পরে আরব মুসলমানেরাও এর গতিকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। আরব জাতীয়তাবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের মধ্য থেকেই আরব অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্বশাসন অর্জন করা এবং আরবী ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।[১] কিন্তু বিশ শতকের সূচনায় নব্যতুর্কী সরকার কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতি হিসেবে তুরানবাদ ও তুর্কীয়করণ নীতি গৃহীত হলে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরব অঞ্চলের স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নব্যতুর্কী সরকারের নেতৃত্বে ওসমানীয় সাম্রাজ্য জার্মানীর পক্ষে অংশ নিলে ব্রিটিশরা আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্বীয় স্বার্থে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আরব অঞ্চলের ভবিষ্যত স্বাধীনতার প্রশ্নে আরব জাতীয়তাবাদী নেতা মক্কার গভর্ণর শরীফ হোসেন একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে ব্রিটেনের সমর্থন লাভের প্রয়াস পান। পারস্পরিক প্রয়োজনে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে ব্রিটিশদের সঙ্গে তার সমঝোতা হয় যা ইতিহাসে হোসেন - ম্যাকমেহন পত্র বিনিময় নামে পরিচিত।[২] এ সমঝোতায় ব্রিটেন কিছু কিছু অঞ্চল বাদ দিয়ে আরব অঞ্চলের ভবিষ্যত স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। কিন্তু একই সময়ে আরব বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করার জন্য গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে গোপনে সাইকস্- পিকো চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তিতে সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী নিয়ন্ত্রণ এবং ইরাক-প্যালেস্টাইনে (ট্রান্স-জর্দানসহ) ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ ছিল।[৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ওসমানীয়া সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মধ্যপ্রাচ্যের ভূখণ্ডে কতগুলো কৃত্রিম সীমারেখা টেনে কয়েকটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয় এবং পুরনো রাষ্ট্রগুলোর সীমানাও নতুনভাবে চিহ্নিত করে। ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সীমানার এই পরিবর্তন সম্পর্কিত ছিল। মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সফলতার ফলে ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের স্থলে বর্তমান তুর্কী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। এদিকে স্যানরেমো সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্ত আরব অঞ্চলের সিরিয়া-লেবাননে লীগ অব নেশনস এর অনুমোদনক্রমে ফরাসী ম্যান্ডেটরী শাসন এবং ইরাক-প্যালেস্টাইনে (ট্রান্স-জর্দানসহ) ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরী শাসন আরোপ করা হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইরাকে রাজতন্ত্রসহ সংসদীয় সরকার এবং প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ হাই কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে একটি বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সিরিয়া-লেবাননে ফরাসী কর্তৃপক্ষ ঔপনিবেশিক ধাঁচের শাসন ব্যবস্থা চালু করে এবং বিভাজন নীতি অনুসরণ করে পরিসীমা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৃহত্তর লেবানন রাজ্যকে আলাদা করে। সিরিয়া ও লেবাননে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয়।[৪] ইরাক ছাড়া অন্যান্য দেশেও পাশ্চাত্য পৃষ্ঠপোষকতায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য বিশ্বের

প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখা। সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল ও তাদের সঙ্গে গাটছড়ায় বাঁধা এসব রাজতন্ত্রের রাজা-বাদশারা স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারাই দেশ শাসন করতেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় স্বীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব নয় - এই বিবেচনায় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্র কায়েম করে যা পর্যায়ক্রমে স্বৈরতন্ত্রে রূপ নেয়।[৫] কিন্তু ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির জন্য সকল দেশে স্থানীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতার গতি ত্বরান্বিত হয় এবং আরব দেশগুলোর মধ্যে ইরাক সর্বপ্রথম **১৯৩২** সনে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং লীগ অব নেশনস এর সদস্য পদ লাভ করে। অন্যান্য আরব দেশও পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীনতাত্তোর ও পরে সিরিয়া-ইরাকে সামন্ত প্রভুদের পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার চাবিকাঠি নিয়ন্ত্রণ করে। আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীবিহীন রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও আদর্শহীন রাজনীতিবিদদের দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা সামরিক বাহিনীকে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেয়। ইতোমধ্যে আদর্শবাদী রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটলেও রাজনীতিতে তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এজন্য প্রথম **১৯৩৬** সনে ইরাকের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে। স্বাধীনতার পর **১৯৪৯** সনে পর পর তিনটি সামরিক অভ্যুত্থান সিরিয়াতে সংঘটিত হয়। **১৯৫২** সনে মিশরে এবং **১৯৫৮** সনে ইরাকে একই ঘটনা ঘটে।[৬] অতঃপর **১৯৬০** এর দশকে বিভিন্ন আরব দেশের রাজনীতিতে ঘন ঘন সামরিক হস্তক্ষেপ ও পাল্টা সামরিক হস্তক্ষেপ সংঘটিত হয়। **১৯৫০** এর দশক থেকে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতা অর্জন করে। প্রথমত বেসামরিক ব্যক্তিত্বরা রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত হলেও পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর দ্বারা উৎখাত হয়ে সেনাতন্ত্র কায়েম হয়। দীর্ঘ সেনাশাসনের ফলে সেনাতন্ত্র একনায়কতন্ত্রে রূপ নেয়। সময়ের বিবর্তনে রাজনৈতিক দল ও সেনাবাহিনীর মধ্যে আবদ্ধতার (Army-Party Symbiosis) ফলে সেনা - রাজনীতিবিদ দেশ শাসন করতে থাকে। পরবর্তীতে সেনাতন্ত্র একনায়কতন্ত্রে রূপ নেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোও এ প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। আরব দেশগুলোতে কয়েকটি কারণে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর আগমন ঘটে। এগুলো হলো:

- ক) সেনাবাহিনীর ওপর ইসলামের গুরুত্বারোপ। ইসলামী চিন্তাবিদরা ক্ষাত্রশক্তির জোরে ক্ষমতা দখলকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে সেনাবাহিনী রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত হয়।
- খ) আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং আদর্শবাদী রাজনীতিবিদের অনুপস্থিতি।
- গ) সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ও তার প্রভাব।
- ঘ) নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও চাহিদা এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক।
- ঙ) **১৯৪৮** সনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর উগ্র বা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব।

- চ) আরব ঐক্যের আবেগ।[৭]

তবে বিংশ শতকের সপ্তম দশক থেকে রাজনীতিতে সেনা আগমনের গতি হ্রাস পেয়েছে। যার কারণ -

- ক) উগ্র বা বিপ্লবী আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার ক্রমহ্রাস।
- খ) স্নায়ুযুদ্ধের গতি-প্রকৃতির হ্রাস।
- গ) ফিলিস্তিন প্রশ্নে সমঝোতার মনোভাবের উদ্ভব।
- ঘ) নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ও সংখ্যা বৃদ্ধি।
- ঙ) ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজয়ের ফলশ্রুতিতে আরব দেশগুলোর মর্যাদা হ্রাস।
- চ) আরব রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, দলাদলি এবং আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
- ছ) সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পারিক আবদ্ধতা (Army-Party Symbiosis)।[৮]

তা সত্ত্বেও সেনাবাহিনী এখনো জনক্ষেত্রে বা সরকারে অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচ্য। প্রায় সকল আরব দেশে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ বা কার্যকরী সমর্থন ছাড়া কোন সরকারের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।[৯]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের নীতি ও ঔপনিবেশিক শাসনামলে আধুনিকীকরণের প্রভাব বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ভৌগো-জাতিসত্তা রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর উপনিবেশ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত ভৌগো-জাতিসত্তা রাষ্ট্রের উদ্ভবের গতিকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু নতুন উদ্ভূত রাষ্ট্রগুলোতে চৌকস আমলাতন্ত্রের অভাব এবং রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি ও আদর্শবাদী রাজনৈতিক দলের অভাবে বিরোধী কণ্ঠ সোচ্চার হয় এবং সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখলে উৎসাহিত করে। এ দেশগুলোতে সেনাশক্তি নয় বরং বেসামরিক কাঠামোর ব্যর্থতা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সেনা আগমনের পথ উন্মুক্ত করে।

অন্যদিকে কোন কোন দেশে রাজতন্ত্র বা পরিবারতন্ত্র কায়েম হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ স্বীয় স্বার্থে পছন্দনীয় সেনাতন্ত্র বা রাজতন্ত্রকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে তা দীর্ঘস্থায়ী করতে উৎসাহিত করে। ধর্মের ব্যবহারের মাধ্যমে একনায়করা সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখে। অবশ্য ধর্মের এই রাজনৈতিক ব্যবহার মধ্যপ্রাচ্যে খুব বেশি হলেও এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই তাদের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই সম্পর্ক ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের একনায়কদের পক্ষে টিকে থাকা দীর্ঘদিন সম্ভব হতো না। এই দেশগুলোর ওপর সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণও দীর্ঘদিনের। এই নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য তারা **১৯৪৮** সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করে তাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি ঘাঁটি ও খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।[১০]

কিন্তু সময়ের বিবর্তনে দেশগুলোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীতে বিভক্ত। এ পেশাজীবী শ্রেণীর বিস্তৃতি উচু স্তর

থেকে নীচু স্ড়র পর্যন্ড়। তারা দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে আগ্রহী এবং গণতন্ত্রমনা। দীর্ঘ শাসন (সেনাতন্ত্র বা রাজতন্ত্র) তাদের অপছন্দ। ফলে বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে তা তাদেরকে দেশের ভবিষ্যত প্রশ্নে এবং গণতন্ত্র চর্চা করতে একতাবদ্ধ করে। এ একতাবদ্ধতা, গণতন্ত্র চর্চার মানসিকতা এবং পাশ্চাত্য আধিপত্যের বিরোধীতার প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ততার ফলাফল হচ্ছে বর্তমান আরব বিশ্বের চলমান সংকটের সূচনা ও বিকাশ।

২

উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় আরবদেশ তিউনিসিয়া ১৫৭৪ সনে ওসমানীয়া সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং ঊনিশ শতকের ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় দেশটি ১৮৮১ সনে ফরাসীদের দ্বারা অধিকৃত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালে এশিয়া ও আফ্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব তিউনিসিয়ায় পড়ে। ১৯৩৪ সনে হাবীব বরগুইবার নেতৃত্বে দেশটিতে নিউ দস্ড়ুর পার্টি গঠিত হলে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন শুর্ব হয়। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে দেশটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫৬ সনে স্বাধীনতা অর্জন করে। দেশটির কর্মধার বরগুইবা দায়িত্ব পালন করেন। তবে অসুস্থতার কারণে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ থেকে আশির দশকের শেষে অব্যাহতি এবং তার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী জেনারেল জইন আল আবিদিন বেন আলী ১৯৮৭ সনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফরাসী শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রভাবের জন্য দেশটি উত্তর আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশী ইউরোপীয়করণকৃত দেশ।[১১] দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে বেন আলী নিজেকে একজন স্বৈরশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষত আরব বিশ্বের চলমান আন্দোলনের সূচনা উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়ায়। আন্দোলনের সূত্র ক্ষুদ্র, কিন্ড়ু তাৎপর্যপূর্ণ। তিউনিসিয়ায় এক ফল বিক্রেতার ভ্যানগাড়ি আটক করেছিল পুলিশ। অভিযোগ, ভ্যানগাড়িটির পারমিট ছিল না। শিক্ষিত কিন্ড়ু কোনো কাজ না পেয়ে ভ্যানগাড়ির মালিক যুবকটি ফল বিক্রির কাজ বেছে নিয়েছিল। যুবকটির সঙ্গে পুলিশ দুর্ব্যবহারও করে। প্রতিবাদে যুবকটি গায়ে আগুন জ্বেলে আত্মাহুতির ঘটনা ঘটায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ২১ বছর পর তিউনিসিয়া জেগে ওঠে। প্রায় ২৩ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট বেন আলির পতন ঘটে। নিজে একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল হয়েও তিউনিসিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বেন আলি সেনাবাহিনীর সমর্থন নিশ্চিত করতে পারেননি। তিউনিসিয়ায় যা ঘটেছে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ছাড়া অন্য কোথাও এ রকম ঘটেনি। তিউনিসিয়ার গণঅভ্যুত্থান হলো আরব বিশ্বে এ ধরনের প্রথম ঘটনা। তিউনিসিয়ায় এ বিপণ্ঢব 'জেসমিন বিপণ্ঢব' নামে খ্যাত যা আরব বিশ্বের রাজনীতিতে একটি নতুন ধারার সূচনা করে।[১২]

৩

তিউনিসিয়ার পর আন্দোলন-বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে মিশরে। পরে আলজেরিয়া, ইয়েমেন, বাহরাইন, লিবিয়া, জর্ডান ও সিরিয়াও এর বিস্ড়ৃতি ঘটে। মিশর আরব বিশ্বের নেতৃস্থানীয় একটি দেশ। ষোল শতকের সূচনায় দেশটি মামলুকদের হাত থেকে ওসমানীয়া তুর্কীরা দখল করে। ওসমানীয়া শাসনামলে দেশটিতে মামলুক সামন্ড় প্রভুদের প্রাধান্য

লক্ষ্য করা যায়। ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে মামলুকদের প্রতিযোগিতার ফলে দেশটিতে বিশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করে। ইউরোপীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এবং বিশৃঙ্খল পরিবেশের সুযোগে ফরাসীরা ১৭৯৮ সনে দেশটি দখল করে। উনিশ শতকের সূচনায় দেশটি ফরাসী দখলমুক্ত হয় এবং মুহাম্মদ আলী পাশা ১৮০৫ সনে মিশরের প্রদেশপাল হিসেবে নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে ওসমানীয়া সুলতানের সঙ্গে সিরিয়া দখলের প্রশ্নে এক দ্বন্দ্বে এবং ইউরোপীয় কূটনীতির চালে মিশরে মুহাম্মদ আলী পাশার বংশীয় শাসন স্বীকৃত ও সীমাবদ্ধ হয়। এসময় সুয়েজ খাল খনন করা হয় এবং অধিক আর্থিক ব্যয় দেশটির অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। দেশের অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা আনয়নের অজুহাতে ব্রিটিশরা ১৮৮২ সনে দেশটি দখল করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় ১৯১৪ সনে দেশটিকে তাদের আশ্রিত বলে ঘোষণা করে। ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় মিশরে রাজতন্ত্র বহাল থাকে। তবে মিশরীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ১৯৩৬ সনে সম্পাদিত ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তিতে দেশটিকে স্বাধীনতা দেয়ার কথা বলা হলেও প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন কিছুটা বিলম্বিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষত ১৯৪৮ সনে আরব-ইহুদী যুদ্ধের পর দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনে সেনাবাহিনী এগিয়ে আসে। মিশরে কর্ণেল জামাল আবদুন নাসেরের নেতৃত্বে ১৯৫২ সনে সামরিক বাহিনীর মধ্যে গঠিত তাদের মুক্ত সেনা সংস্থার উদ্যোগে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে।[১৩]

সেনা বিপণ্ঢবের পর মুহাম্মদ আলী পাশার বংশীয় সর্বশেষ রাজা ফার্বক বিতাড়িত হন এবং মিশর একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মিশরে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সরকার ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৫৪ সনে জেনারেল নাগিবকে ক্ষমতাচ্যুত করে কর্ণেল জামাল আবদুন নাসের প্রেসিডেন্ট হন এবং নানামুখী সংস্কার করে দেশকে অগ্রসর করান। নাসেরের আরব ঐক্যের আহবান এবং ইসরায়েল বিরোধী ভূমিকা আরব বিশ্বে প্রশংসিত হয়। বিশেষ নেতা হিসেবে তিনি স্বীকৃত হন। ১৯৭০ সনে তার আকস্মিক মৃত্যুতে প্রেসিডেন্ট হন আনোয়ার সাদাত। তিনি কিছুদিন তার পূর্বসূরী নাসেরের পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করলেও আস্ড়ে আস্ড়ে পাশ্চাত্য বিশ্ব বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আরব বিশ্বের বিরোধীতা সত্ত্বেও ইসরায়েলের সাথে শান্ড়ি চুক্তি (ক্যাম্পডেভিড চুক্তি) সম্পাদন করেন ও স্বীকৃতি প্রদান করেন।[১৪] এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত ইসলামিক ব্রাদারহুড সমর্থিত সেনাসদস্যদের হাতে তিনি নিহত হন। ১৯৮১ সনে অক্টোবরে এ ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট হন তার ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা হোসনী মোবারক। তিনি সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা না করে বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিস্ড়ার ঘটান এবং ক্ষমতার অপব্যবহারসহ জনগণের ওপর দমন-পীড়নের নীতি অনুসরণ করেন। একজন সেনানায়ক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকেন। নির্বাচন দিয়ে তার সমর্থিত দল এনডিপি এর সদস্যদের বিজয়ী করান। ফলে প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চা ব্যাহত হয় - যা উদার মতবাদ প্রসারিত হওয়ার পূর্বশর্ত। ফলে আস্ড়ে আস্ড়ে জনমত তার বির্বদ্ধে যায়। বর্তমান মিশরের সংকটের মূলে তার অনুসরিত নীতি এবং এ নীতির বির্বদ্ধবাদী হচ্ছে মিশরের তর্বন সমাজ যারা ইন্টারনেট ও ফেসবুক জেনারেশন বলে স্বীকৃত। তারা ইন্টারনেট বা ফেসবুক ব্যবহার করে মোবারকের বির্বদ্ধে জনমত গঠন করে।[১৫] দীর্ঘদিন কারও ক্ষমতায় থাকা জনগণ কখনোই পছন্দ করে না। মিশরসহ অন্য

কয়েকটি দেশের বেলায়ও হয়েছে ঠিক তাই। প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের অপসারণে আন্দোলনের শুরুতে জনবিক্ষোভের কারণ ছিল মূলত দুর্নীতি, বেকারত্ব, গণতান্ত্রিক অধিকারের অনুপস্থিতি।[16] ফলে বিগত ২৪ জানুয়ারি শুরু হয় মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের শাসনবিরোধী এক গণঅভ্যুত্থান। জনবিক্ষোভে মোবারক শেষ পর্যন্ত ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১১ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। মোবারক সেনাবাহিনী প্রয়োগ করে তা দমনের প্রয়াস পান। কিন্তু মিশরীয় সেনাবাহিনী পেশাদারিত্ব বজায় রাখে এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। ফলে মোবারকের এই পদত্যাগ।

হোসনি মোবারকের ৩০ বছর মিশর দমনমূলক জরুরী আইনে শাসিত হয়েছে। এই আইন মিশরীয়দের মত প্রকাশ, সংগঠন করা ও জমায়েত হওয়ার অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং বন্দী করেছে হাজার হাজার রাজনৈতিক অসন্তোষ প্রকাশকারীকে। মিশরে হোসনি মোবারকের শাসনের অবসানের পর পার্লামেন্ট ও সংসদ বাতিল করা হয়েছে। সামরিক কাউন্সিল ৬ মাসের মধ্যে একটি নির্বাচন আয়োজন করার কথা বলেছে। মোবারকের ক্ষমতা ছাড়ার আগ মুহূর্তে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল, যারা সংবিধান সংশোধনের সুপারিশ করে। এতে করে এক ধরনের জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হতে পারে। দু'টি জিনিস হতে পারে মিশরে। **এক.** প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কমিয়ে প্রেসিডেন্টকে অলঙ্কারিক পদে রাখা। **দুই.** একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। জনগণের ভোটে সংসদের প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচিত হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার পরিচালনা করবেন। এ ক্ষেত্রে পর্দার অন্তরালে থেকে সেনাবাহিনী 'ওয়াচডগ' হিসেবে কাজ করবে।[17]

এখন মিশরে যে অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করছে তা কার্যত একটি সামরিক সরকার। তারা ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করবে না বলেও ঘোষণা দিয়েছে। অথচ এই চুক্তি অবসানের ওপরই নির্ভর করছে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি। মিশরে কী একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, নাকি নতুন মোড়কে পুরাতন ব্যবস্থাই জারি থাকবে তা আগামী দিনই বলতে পারবে।[18]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিশরে সংবাদপত্র তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সক্রিয়। মিশরে সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যাও অনেক। মিশরকে বলা হয় আরব বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী। অগ্রসর চিন্তার মানুষ যে দেশে বেশি, যে দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তুলনামূলকভাবে অধিকতর সক্রিয় সে দেশে গণতন্ত্র কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ আশ্রয়ী রাষ্ট্র কাঠামোতে সে আশা কতটুকু বাস্তবায়িত হবে বলা যায় না।[19]

সংস্কারের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তন হবে তাতে মিশরে মার্কিনীদের নিয়ন্ত্রণ আগের মতো থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া মিশরে মার্কিন বিরোধিতাও যথেষ্ট শক্তিশালী। সেখানকার জনগণ মিশর-ইসরায়েল সম্পর্কেরও ঘোর বিরোধী। এই বিরোধিতাও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। মিশরে এখন যে রাজনৈতিক সঙ্কট গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে তার সমাধানের ক্ষেত্রে যে তিন শক্তির ভূমিকা আছে তা হলো - মিশরের জনগণ, মিশরের সামরিক বাহিনী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই তিন শক্তির সমন্বয়ে কিভাবে মিশরের সঙ্কটের সমাধান আপাতত হবে এটা এখন নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। কিন্তু এর ফলে সে দেশের শাসন ব্যবস্থায় একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটে তার উদারনীতিকরণের পথ

যে প্রশস্ত হবে এটা সঙ্গতভাবেই বলা যায়।[20] সুতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেনা পরিষদ কী ভূমিকা পালন করে, সেটাই দেখার বিষয়। আগামী শাসন ব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারণের অস্পষ্টতায় মিশরে বর্তমানে আবারো গণঅসন্তোষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কায়রোর তাহরির স্কয়ারে সংস্কারের দাবিতে এখনো জনতার বিক্ষোভ চলছে।

৪

পারস্য উপসাগরের আরব উপকূলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে দ্বীপ রাষ্ট্র বাহরাইনের ভৌগোলিক অবস্থান। তেত্রিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রটি ১৮৬১ সনে ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্য হিসেবে স্বীকৃত। দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ব্রিটেন অন্যান্য উপসাগরীয় ছোট ছোট শেখ শাসিত অঞ্চলের সঙ্গে ব্রিটেন যে সম্পর্ক গড়ে তোলে এটি তারই ধারাবাহিকতা। ব্রিটেনের কূটনৈতিক তৎপরতায় বাহরাইন ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা অর্জন করে। প্রথম উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্র হিসেবে বাইরাইন ১৯৩৪ সন থেকেই তেল রপ্তানী করে আসছে। এখানে খলিফা বংশীয় শাসন চালু আছে এবং ১৯৯৯ সন থেকে শাসক হচ্ছেন - শেখ হামাদ ইবনে ইসা আল-খলিফা।[21]

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহকের দেশ ইয়েমেন। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বৃষ্টিপাত হওয়ায় এটি উর্বর অঞ্চল। ইসলামপূর্ব আরবে সাবাহ বংশীয় শাসনামলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে দেশটির অবদান সর্বজন স্বীকৃত। ইসলামী আমলে দেশটি বিভিন্ন বংশীয় শাসনাধীনে ছিল। ষোল শতকে এটি মামলুক নিয়ন্ত্রণ থেকে ওসমানীয়া নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৮৩৯ সন থেকে ব্রিটেন তার ভারত রক্ষার নীতির আলোকে দেশটিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। দেশের শাসনব্যবস্থার চরিত্র নির্বাচনে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনে দেশটি বিভক্ত হয়। ১৯৬৭ সনে এডেন থেকে ব্রিটেন সরে যাবার ঘোষণা দিলে উত্তর ইয়েমেন দক্ষিণ ইয়েমেন দখল করে এবং ১৯৭০ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ স্থায়িত্ব লাভ করে। ১৯৯০ সনে উভয় অংশ একত্রিত হয় এবং আলী আব্দুল্লাহ সালেহ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[22]

আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশ দু'টিতেও বৎসরের গোড়াতে গণআন্দোলনের সূচনা হয়। গণআন্দোলনের মুখে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ ১৯১৩ সনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেও সেখানে আন্দোলনে ভাটা পড়ে নি। বিরোধীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে সালেহ তার অঙ্গীকার অনুযায়ী পদত্যাগ করবেন না। এদিকে সালেহর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ চলছে। এছাড়া সেনাবাহিনীর কয়েকটি স্বপক্ষত্যাগী ইউনিট ও উপজাতীয় যোদ্ধাদের মোকাবেলা তাকে করতে হচ্ছে। উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যস্থতায় একটি ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তিতে সই করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট সালেহ। চুক্তি অনুযায়ী, বিচার থেকে দায় মুক্তির বিনিময়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদরাবুহ মনসুর হাদির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন প্রেসিডেন্ট সালেহ। গত মার্চে প্রথম এই সমঝোতা চুক্তির বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। সালেহ প্রথমে এ চুক্তি মেনে নিবেন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তিনি এখনো ওই চুক্তিতে সই করেননি। সউদী আরব থেকে দেশে ফিরে তিনি বলেন, উভয় পক্ষ বিশেষত বিদ্রোহীরা অনড় থাকলে দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হবে। সালেহর প্রতিদ্বন্দ্বিদের মধ্যে

রয়েছেন জেনারেল আলী মোহসিন আল আহমার। তিনি গত মার্চে বিক্ষোভ-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এছাড়া রয়েছে শক্তিশালী আহমার পরিবার। চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে সালেহ জেসিসি'র মধ্যস্থতায় প্রস্ড়াবিত চুক্তির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানিয়েছেন এবং চুক্তি স্বাক্ষর বিলম্বের জন্য বিক্ষোভকারীদের দায়ী করেন।[২৩] তবে গণআন্দোলনের তীব্রতায় তিনি অতি সম্প্রতি পদত্যাগের সিদ্ধান্ড় জানিয়েছেন। জর্দানেও সরকার বিরোধী আন্দোলনের মুখে বাদশা তার প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ড় করেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলেছেন। বাইরাইনে সউদী সেনার উপস্থিতিতে আপাতত আন্দোলন সম্বন্ধে আর বেশী কিছু শোনা যাচ্ছে না। সউদী আরবও সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি নারীদের ভোটাধিকারসহ নির্বাচনে প্রার্থী হবার ঘোষণাও দেয়া হয়েছে।[২৪] আরব বিশ্বে যে গণআন্দোলনের জোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হবে। তবে এ মুহূর্তে আরব বিশ্বের পরিস্থিতি অনেকটা অস্বচ্ছ ও অনিশ্চিত এবং এর জন্য অনেকাংশে দায়ী পাশ্চাত্য জগতের ভ্রান্ড় মধ্যপ্রাচ্য নীতি।

৫

মিশরের পশ্চিমপ্রান্ড়ে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরীয় দেশ - আফ্রিকার লিবিয়া ১৫৫১-১৯১১ পর্যন্ড় সামান্য বিরতি ছাড়া ওসমানীয়া শাসনাধীনে ছিল। ১৯১১ সনে ঔপনিবেশিক শক্তি ইটালী কর্তৃক লিবিয়া অধিকৃত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইটালীর দাবী পরিত্যক্ত হলে ১৯৫১ সনে জাতিসংঘের উদ্যোগে লিবিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীন লিবিয়ায় প্রথম রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাইরেনিকার আমীর মোহাম্মদ ইদ্রিস আল সানূসী। ১৯৫৯ সনে তেল আবিস্কৃত হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং এ সম্পদ আধুনিকীকরণে ইদ্রিসের প্রয়াসে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একদিকে গোত্রীয় বিভক্তি এবং অন্যদিকে কট্টরপন্থী সানূসী সম্প্রদায়ের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে ১৯৬৯ সনে দেশটিতে গাদ্দাফীর নেতৃত্বের সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং রাজা ক্ষমতাচ্যুত হন। আরব জাতীয়তাবাদের সমর্থক এবং সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী ব্যক্তি হিসেবে গাদ্দাফী দেশ শাসন করতে থাকেন। পাশ্চাত্য বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে যদিও ১৯৯০ এর দশকে সমঝোতার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আসে। অনুসৃত বিদেশ নীতিতে বিতর্কিত হলেও অভ্যন্ড়রীণ ক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কারের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজ করে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তবে চার দশকেরও বেশী ক্ষমতায় থাকার ফলে অভ্যন্ড়রীণ ক্ষেত্রে তার বিরক্ষবাদীরা সংঘটিত হয় এবং বহিঃশক্তির পরোক্ষ প্রভাবে সাম্প্রতিককালে দেশে তার শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয়।

বছরের গোড়াতেই ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট জইন আল আবেদীন বেন আলী ও মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতনে উদ্বুদ্ধ হয় লিবিয়ার জনগণ। তবে আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করেন প্রায় ৪২ বছর ধরে লিবীয় শাসক গাদ্দাফী। তার দমন-পীড়নে কোনঠাসা হয়ে পড়ে বিদ্রোহীরা। গাদ্দাফীর কঠোর মনোভাবের কারণে বিলম্ব না করে বিদ্রোহীরাও তাৎক্ষনিক হাতে তুলে নেয় অস্ত্র। বেনগাজীভিত্তিক এ

বিদ্রোহ সংগঠিতকরণে পশ্চিমা কূটনীতিক, তেল কোম্পানীগুলোর প্রতিনিধি, অতি উচ্চ বেতনভুক্ত পাশ্চাত্য ঘেঁষা সেনা এবং ব্রিটিশ ও ফরাসী গোয়েন্দাদের তৎপরতা ছিল। গাদ্দাফীর কঠোর অবস্থানের বিপরীতে শীঘ্রই বিদ্রোহীরা সংগঠিত হয় এবং গঠন করে ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল (এনটিসি)। পূর্বাঞ্চলীয় শহর বেনগাজীকে ঘাঁটি করে এনটিসি মূলত ছয় মাসের অধিক সময় ধরে সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়।

লিবিয়ার অবস্থা তিউনিসিয়া বা মিশরের মতো নয়। তিউনিসিয়া ও মিশরে গণবিক্ষোভের কয়েকদিনের মধ্যেই শাসকচক্রের পতন ঘটে। কিন্ড়ু লিবিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন হয় নি। কারণ -

ক) ঐ দুদেশের সরকার যেভাবে জনসমর্থনহীন ছিল লিবিয়ার সরকার সেভাবে জনসমর্থনহীন ছিল না।

খ) গাদ্দাফী ফ্যাসিস্ট কায়দায় দেশ শাসন করলেও দেশের জনগণের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নারীর অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধন করেছেন, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।

গ) গাদ্দাফীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও লিবিয়াকে সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন ক্ষেত্রে পরিণত হতে না দেয়ার জন্য তার অনুসৃত বৈদেশিক নীতিও জনগণের মধ্যে তার সমর্থনের একটা ভিত্তি।[২৫]

লিবিয়ায় দীর্ঘদিন আগে বিভিন্ন অঞ্চলে তেল আবিষ্কৃত হয়। তখন থেকেই তাদের তেলের ওপর ব্রিটিশসহ অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। রাজা ইদ্রিসকে লিবিয়া থেকে বিতাড়িত করে সেখানে ১৯৬৯ সালে গাদ্দাফী ক্ষমতা দখল করার পর থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তেলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন না হলেও তার ওপর লিবিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। এতে সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষুব্ধ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের সঙ্গে গাদ্দাফীর সম্পর্কের অবনতি একপর্যায়ে পৌঁছে শত্রুতার পর্যায়ে। প্রেসিডেন্ট রিগানের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই সম্পর্কের চূড়ান্ড় অবনতি ঘটে। পরে গাদ্দাফী ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি করেন এবং তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তেল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক স্বার্থ পূরণের বিনিময়ে এই সমঝোতা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদীরা লিবিয়ায় হস্ড়ক্ষেপ না করার ব্যাপারে স্বীকৃত হয়। সম্পর্কের এই উন্নতি সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লিবিয়ার সম্পর্ক তিউনিসিয়া, মিশর বা সউদী আরবের মতো হয়নি। দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বেনগাজিতে তেলের বিরাট মজুত আছে। লিবিয়ার তেল ক্ষেত্রগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও পূর্বাঞ্চল তেলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ তেল ক্ষেত্রগুলোর দখল নিতে সাম্রাজ্যবাদীরা লিবিয়ায় সামরিক আগ্রাসনের পরিকল্পনা করে।[২৬]

লিবিয়ার এই গৃহযুদ্ধ একান্ড়ই তার নিজস্ব সংকট হলেও গাদ্দাফীর সশস্ত্র সেনাদের হাত থেকে লিবিয়ার 'নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণকে রক্ষা' করার জন্য ন্যাটো জোট লিবিয়ায় যে সামরিক হস্ড়ক্ষেপের সূচনা ও জোরদার করেছে তা উপনিবেশবাদের নতুন চেহারা; নয়া

উপনিবেশবাদ। আমেরিকার 'মুক্তি ও গণতন্ত্র' রপ্তানির বাজার সিলেক্টিভ। সব স্বৈরশাসকের দেশে তারা ওগুলো রপ্তানী করে না। স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে গাদ্দাফী ছিলেন শত্রুপক্ষের মিত্র। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পরও তার অবস্থান পরিবর্তিত হয়নি। ওবামা আসার আগে প্রেসিডেন্ট বুশ আফ্রিকা অঞ্চলে আমেরিকার আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে 'ইউএস আফ্রিকা কম্যান্ড' (আফ্রিকম) গঠন করেছেন; আফ্রিকার ৪৯টি দেশ সেটিতে যোগ দিয়েছে, কিন্তু গাদ্দাফী যোগ দেননি।[২৭]

উপরন্তু তেলের দাম পড়ে গেলে ২০০৯ সালের শুরুর দিকে তিনি বলেছিলেন তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর উচিত বিদেশি কোম্পানিগুলোর হাত থেকে তেলক্ষেত্রগুলো নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নেয়া বা জাতীয়করণ করা। বহুজাতিক বিদেশি কোম্পানি যেমন- অ্যাংলো-ডাচ কোম্পানি শেল, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, মার্কিন কোম্পানি এক্সনমবিল, হেস কর্প, ম্যারাথন অয়েল, অক্সিডেন্টাল, ওএমভি, নরওয়ের ষ্টেটঅয়েল, ইতালির এনি, কানাডীয় পেট্রো কানাডা ইত্যাদি বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রডাকশন শেয়ারিং অ্যাগ্রিমেন্ট সংশোধন করে গাদ্দাফী ৫৪০ কোটি মার্কিন ডলার রাজস্ব জমা করেছিলেন লিবিয়ার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। এতেও বিদেশীরা ক্ষুব্ধ।[২৮] তাছাড়া গাদ্দাফী সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করেন রাশিয়ার কাছ থেকে। বেসামরিক খাতেও রাশিয়ার সঙ্গে গাদ্দাফীর লিবিয়ার ব্যবসা অনেক। লিবিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্রদের যে সীমাহীন লোভ তা সংকটকে ঘনিভূত করেছে। লিবিয়ার ঘটনাপ্রবাহ উপনিবেশবাদের পুনর্জন্ম বলে বিবেচ্য।[২৯]

গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেয়া লিবিয়ার সাধারণ নাগরিকদের গাদ্দাফীর সামরিক বাহিনীর হত্যাকান্ড থেকে রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ব্রিটেন ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী দেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ১৯৭৩ নম্বর প্রস্তাব পাস করে লিবিয়ায় গাদ্দাফীর সামরিক বিমান উড়ানো বন্ধের উদ্দেশ্যে সে দেশে নো ফ্লাই জোন ঘোষণা করে। পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেয়। গত ৩১ মার্চ জাতিসংঘের অনুমোদনে লিবিয়া অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করে পশ্চিমা দেশগুলোর জোট ন্যাটো।

বিদ্রোহীদের ক্রমাগত আন্দোলনের মুখে ও পাশ্চাত্য বিশ্ব বিশেষত ন্যাটো জোটের সহায়তায় গাদ্দাফী বাহিনী কোনঠাসা হতে থাকে। ক্রমাগত সফলতায় গত আগষ্ট/১১ মাসের শেষদিকে গাদ্দাফীর অনুগত সেনাদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের তীব্র লড়াই গাদ্দাফীর বাসভবন চত্বর বাব আল-আজিজিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকে। বিদ্রোহীদের ক্রমাগত সফলতায় ২৩/৮/১১ তারিখে তারা বাব আল আজিজিয়ায় ঢুকে পড়ে। ন্যাটোর সহযোগিতায় বিদ্রোহীরা সাফল্যের মুখ দেখতে থাকে এবং এনটিসি এর নেতৃত্বে তারা ১৯/৮/২০১১ তারিখ রোববার রাজধানী ত্রিপোলীর দখল নেয়। এ সময় গাদ্দাফীর অবস্থান নিশ্চিত হওয়া না গেলেও তার ছেলে সাইফ আল গাদ্দাফী বিদ্রোহীদের ত্রিপোলীতে ঢুকতে দেয়াকে কৌশল হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। নিজের বাসভবন বাব আল- আজিজিয়া পতনের পর গাদ্দাফী গোপন আস্তানা থেকে ন্যাটো ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার আহবান জানিয়ে বলেন, 'জিতব, নাতো শহীদ হব'। তবে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তার কথার কোন মিল নেই। তার অনুগত সেনারা পলায়নপর এবং বিদ্রোহীরা ক্রমাগত অগ্রসরমান। একের পর এক শহরে বিদ্রোহীরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে চলেছে এবং শেষাবধি তারা বানি ওয়ালিদ শহর

অবরুদ্ধ করেছে। আত্মসমর্পনের জন্য নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে সেখানে আক্রমণ পরিচালিত হয়। লিবিয়ায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মোতায়েনের বিরোধিতা করেছে এনটিসি। আত্মগোপনে থাকা লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে হত্যা না করতে সংশিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান। ইতোমধ্যে ইন্টারপোল গাদ্দাফীকে গ্রেফতারের নির্দেশনা জারী করেছে।

গত ১২/৯/২০১১ তারিখ সোমবার আগামী ১০ দিনের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়েছে লিবিয়ার বিদ্রোহীদের ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল (এনটিসি)। এনটিসির উপ-প্রধান মাহমুদ জিবরিল ত্রিপোলীতে অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণা দিয়ে বলেন, লিবিয়া মুক্ত হওয়ার পর আরেকটি সরকার গঠন করা হবে। এদিকে গাদ্দাফীর তৃতীয় ছেলে সাদি গাদ্দাফী সীমান্ত অতিক্রম করে গত ১১/৯/২০১১ তারিখ প্রতিবেশী দেশ নাইজারে প্রবেশ করেছেন। অবশেষে তীব্র সংঘর্ষের পর স্বৈরশাসক গাদ্দাফী ২০/১০/২০১১ তারিখে বনিওয়ালিদ শহরে এনটিসির যোদ্ধাদের হাতে নিহত হন।

চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পূর্বে আরবলীগ, মিসর, মরক্কো ও ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন আরবদেশ বিদ্রোহীদের সংগঠন ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আরবলীগ প্রধান নাবিল আল-আরাবী এনটিসি'র নেতৃত্বে চলমান সব ধরনের প্রচেষ্টার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। গাদ্দাফীর দেশ জুড়ে দমন-পীড়নের ফলে আরবলীগ লিবিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করে। তাছাড়া সংগঠনটি লিবিয়ায় নো ফ্লাই-জোন প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমাদের ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানায়। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্য বিশ্বসহ এনটিসিকে স্বীকৃতি দানকারী দেশের সংখ্যা ৬০টির বেশী।[৩০] চীনও লিবীয় নেতা গাদ্দাফীর শাসন অবসানে জনগণের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে রাশিয়া এবং আলজেরিয়া এখনও স্বীকৃতি দেয়নি। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন লিবিয়ার নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, সংবিধান তৈরি ও সুষ্ঠু নির্বাচনসহ গুরুত্বপূর্ণ সব ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। ইতোমধ্যে আফ্রিকান ইউনিয়ন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আরবলীগ ও অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থার নেতাদের সমন্বয়ে নিউইয়র্কে এক বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। এ বৈঠকের উদ্দেশ্য ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ মসৃন করা।

তবে গোটা লিবিয়ায় এখনও এনটিসি এর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরে গোলযোগ বিদ্যমান রয়েছে। চূড়ান্ত বিজয়ের পর এনটিসি সমস্যা হিসেবে ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে। গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য তাৎক্ষনিকভাবে গঠন করা এনটিসি'র কোন বৈধতা নেই। কারণ এর সদস্যরা দেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। সরকার পক্ষ ত্যাগ করে আসা শীর্ষ কর্মকর্তারাই মূলতঃ সংগঠনটির দায়িত্ব নেন। কাজেই তাদের নেতৃত্ব লিবীয় জনগণ মানবে কি না তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। উপরন্তু মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য তাদের অনেকের বিরুদ্ধে বিচারের দাবী উঠতে পারে। তাছাড়া এনটিসি এর নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব। তবে এনটিসি কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিকভাবে তারাই দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।এরপর সাধারণ নির্বাচন দিয়ে জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই সরকার গঠন করা হবে। ক্ষমতা গ্রহণের ৮ মাস পর অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন এবং নির্বাচন

পরিচালনায় জাতিসংঘের সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। এনটিসি তাদের নির্বাহী কার্যালয় বেনগাজী থেকে ত্রিপোলীতে স্থানান্তরের ঘোষণা দিয়েছে।[৩১]

উল্লেখ্য যে, লিবিয়ায় বিদ্রোহী গোষ্ঠী ন্যাটোর সামরিক সহায়তা ও পশ্চিমা শক্তির রাজনৈতিক সমর্থনে লিবিয়াকে গাদ্দাফী মুক্ত করেছে। জনগণের সমর্থন ছাড়া কোন শাসক ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। লিবীয় জনগণ বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে স্বাগত জানিয়েছে এ বিবেচনায় যে, তারা অত্যাচারী ও জবরদখলকারী শাসকের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করেছে। কিন্তু বিদেশী শক্তির অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হলে তারা তা মেনে নিবে না। অতএব আফগানিস্তান ও ইরাকের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টির আগেই ন্যাটো বাহিনীর উচিত বিদ্রোহীদের হাতে কর্তৃত্ব হস্তান্তর করে লিবিয়া ত্যাগ করা। আশু প্রয়োজন লিবিয়ার জনজীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনা। সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ এড়াতে অন্তর্বর্তী সরকারে সব জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা উচিত। সর্বোপরি দেশটিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ও আই সি, আরবলীগ ও আফ্রিকান ইউনিয়নের অগ্রণী ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিদেশী শক্তির অবস্থানের মেয়াদ যত দ্রুত সম্ভব অবসান হওয়া অপরিহার্য। প্রতিহিংসা ও হানাহানির অবসান ঘটানো জরুরী।[৩২]

এদিকে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলীকে মুক্ত ঘোষণার পাশাপাশি এনটিসি ২০ মাস অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য একটি রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু করেছে। যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত এনটিসি প্রতিনিধি গুমা আল গামাতি রূপরেখা তৈরির কথা জানিয়ে বলেন, উক্ত ২০ মাস সময়ের মধ্যে নির্বাচিত একটি কাউন্সিল লিবিয়ায় খসড়া সংবিধান তৈরির জন্য কাজ করবে। আল গামাতি জানান, প্রথম আট মাস লিবিয়া পরিচালনা করবে এনটিসি। এরপর ২০০ ব্যক্তিকে সরাসরি নির্বাচিত করে একটি কাউন্সিল গঠিত হবে। এই কাউন্সিলে খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে। পরে তা গণভোটে দেয়া হবে। এক বছরের মধ্যে ওই কাউন্সিল সংসদীয় ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করবে। তার মতে সব মিলিয়ে ২০ মাসের মধ্যে লিবিয়ার জনগণ নির্বাচিত সরকার পাবে।[৩৩]

গত ১/৯/১১ তারিখে লিবিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক হয় প্যারিসে। এতে অন্তত ৬০টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেন। বৈঠকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলা সারকোজি বলেন, যতদ্রুত সম্ভব লিবিয়ায় দেড় হাজার কোটি মার্কিন ডলারের সম্পদ থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে এবং লিবীয় জনগণের হাতে তা ফেরত দেয়া হবে। গ্রেফতার করে গাদ্দাফীর বিচার লিবিয়ার মাটিতে নাকি আন্তর্জাতিক আদালতে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে লিবিয়ার জনগণ। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনও বিচার প্রসঙ্গে একই মন্তব্য করেন। প্যারিস বৈঠকে এনটিসির প্রধান মুস্তফা আব্দুল জলিল লিবীয় জনগণকে সাহসী ও দৃঢ়চেতা হিসেবে উল্লেখ করে গাদ্দাফীকে হটানোর প্রসঙ্গ টানেন। জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি মতৈক্য, স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে বলেন।[৩৪]

গত ২০/৯/২০১১ তারিখ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গণতন্ত্রের পথে উত্তরণে আরব দেশগুলোকে সহায়তা বিষয়ক জি-৮ সম্মেলনের পর লিবিয়ার অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ জিবরিল আগাম ১০ দিনের মধ্যে একটি নতুন সরকারের নাম ঘোষণার আভাস দেন। ২০/৯/২০১১ তারিখ দেশটির নতুন শাসকেরা গাদ্দাফীর অনুগত সেনাদের দখলে থাকা

দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর সাবহা জয় করার কথা ঘোষণা করেন। জিবরিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেন। গাদ্দাফীর পতনের পর দেশটির অন্তর্বর্তী শাসকেরা এর মধ্যে ওয়াশিংটন, আফ্রিকান ইউনিয়ন (এইউ) ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থন পেয়েছে। জাতিসংঘে ওড়ানো হয়েছে লিবিয়ার নতুন পতাকা।

বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় অন্তর্বর্তী পরিষদ (এনটিসি) এখনো পুর্বাঞ্চলীয় নগর বেনগাজীভিত্তিক। দেশের বিভক্ত উপজাতি ও স্থানীয় জনগণকে এক কাতারে নিয়ে আসার ব্যাপারে তারা প্রশ্নের সম্মুখীন। উপরন্তু, গাদ্দাফীর অনুগত সেনাদের নিয়ন্ত্রণে এখনো কয়েকটি শহর ছাড়াও সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয়নি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিরও অভাব রয়েছে তাদের সামনে। মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা নির্বাচন, সরকার ত্রিপোলীকেন্দ্রিক না মন্ত্রনালয়গুলো দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বিভক্ত হবে তা নিয়ে চলছে অন্তর্বর্তী নেতাদের মধ্যে আলোচনা। তবে এইউ এর নেতাদের স্বীকৃতি এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়ায় এনটিসি'র কূটনৈতিক সমর্থন জোরদার হয়েছে বলা যায়।

এদিকে এখনো গাদ্দাফীর জন্ম শহর সারতে ও বানি ওয়ালিদে লড়াই চলছে। বিদ্রোহীরা তীব্র প্রতিরোধের মুখে। সমন্বয়ের অভাব ও নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে এনটিসি যোদ্ধারা তেমন অগ্রসর হতে পারছে না। যদিও ন্যাটো বিমান হামলা চালিয়ে সহায়তা করছে। কয়েকদিনের ব্যবধানে পরিস্থিতি বিদ্রোহীদের অনুকূল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ইতোমধ্যে এনটিসি প্রধান মুস্তফা আব্দুল জলিল ও লিবিয়ার অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ জিব্রিল যৌথভাবে গত ৩.১০.২০১১ তারিখ নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন মাহমুদ জিব্রিল। পাশাপাশি তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়েরও দায়িত্ব নিয়েছেন। ফলে বিদায় নিয়েছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আল-ইসাবি। অর্থনীতিবিদ আলী আল তারহোনি তেলমন্ত্রী পদে থাকবেন।[৩৫] তবে এখনো লিবিয়ার ভবিষ্যৎ স্বচ্ছ নয়।

সে যাহোক স্বৈরশাসকের পতনে দেশটিতে শান্তি আসবে কিনা তা অনেকটা নির্ভর করছে বিদ্রোহীদের সংগঠন ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল এবং তাদের সমর্থক পশ্চিমা শক্তির আচরনের উপর। ন্যাটো বাহিনী যদি ইরাক বা আফগানিস্তানের মতো লিবিয়ায় দখলদারিত্ব বজায় রাখে, তাহলে শান্তি হবে সুদূর পরাহত। বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন, লিবিয়ার অবস্থা ইরাকের মতো হতে পারে। ২০০৩ সনে স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর হানাহানি ও সহিংসতা যেভাবে বেড়ে গিয়েছিল, লিবিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, লিবিয়া এখন একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষনে আছে। নতুন নেতৃত্ব তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হলে সংঘর্ষ ও রক্তপাত সামনের দিনে অনিবার্য।[৩৬]

৬

ভূমধ্যসাগরীয় তীরবর্তী ভৌগোলিক সিরিয়া (সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন ও জর্দান) পনের শতকের সূচনায় ওসমানীয়া সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভৌগোলিক সিরিয়া তার অস্তিত্ব হারায়। ফরাসী ম্যান্ডেটরী শাসনামলে সামন্ত প্রভুদের দ্বারা সিরীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আদর্শহীন রাজনীতিবিদদের রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতা সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিতে আগমনের সুযোগ করে দেয়। ১৯৫০ এর দশকের সূচনায় স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় দেশটি ১৯৫৮ সনে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে মিসরের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু ১৯৬১ সনে এই সংযুক্তি ভেঙ্গে যায় এবং সিরীয় রাজনীতিতে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এর এক পর্যায়ে ১৯৭০ সনে আলাবী সম্প্রদায়ের হাফিজ আল আসাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। অদ্যাবধি তার পরিবার ক্ষমতায় আছে। পূর্বাপর আলোচনায় এটি প্রতীয়মান হয় যে, কয়েকটি কারণে সিরীয় রাজনীতি জটিল। এগুলোর মধ্যে

ক) রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকৃতি
খ) জনগণের জাতিতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় বিভিন্নতা বা বিভাজন
গ) তাদের স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পার্থক্য এবং প্রায়শই সংঘর্ষিক অবস্থা
ঘ) আঞ্চলিক শক্তিবর্গের ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের প্রভাব
ঙ) বৃহৎ শক্তিবর্গের নীতি ও কর্মকান্ড
চ) সামরিক কর্মকর্তাদের মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাভিলাসী ধারনা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে চরম দলাদলি এবং সর্বোপরি সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক দলের স্থায়ী ঐক্য।[৩৭]

তবুও লক্ষ্যণীয় যে ১৯৬০ এর দশকের প্রাথমিক বছরগুলোতে শহরে সুন্নী মুসলিম এলিট যাদের অধিকাংশ সামন্ত প্রভু রাজনীতিতে তাদের প্রভাব ছিল। কিন্তু ১৯৬৬ সন থেকে তুলনামূলকভাবে শিয়া ধর্মের অনুসারী একটি ক্ষুদ্র উপ-সম্প্রদায় আলাবীরা সিরীয় রাজনীতিতে কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজনীতিতে সুন্নী এলিটদের প্রাধান্য হ্রাসের এবং আলাবীদেরও রাজনীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পটভূমি রয়েছে।

দুটো প্রতিষ্ঠান - বা'আস দল ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে আলাবীরা সিরিয়াতে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমদিকে এ দুটো প্রতিষ্ঠানে সুন্নী মুসলমান প্রাধান্য থাকলেও পরে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পদ্ধতি গড়ে তুলতে ব্যর্থতায় তাদের স্থান আলাবীরা পর্যায়ক্রমে দখল করে। ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত আলাবীদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কারণ আর্থিকভাবে তারা বঞ্চনার শিকার বলে তাদের মনে ধারনা জন্মায়। ফরাসী ম্যান্ডেটরী শাসনামলে বৈরিতার কারণে সুন্নী মুসলমানদের চেয়ে আলাবীদের জন্য সেনাবাহিনীর দরজা খোলা হয়। সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদ ও কৌশলগত অবস্থানগুলো তারা দখল করে। রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে আগমনে উৎসাহিত করে।[৩৮]

আরব বা'আস সমাজতান্ত্রিক দলের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী আলাবীদের আকৃষ্ট করে। সেনাবাহিনীর আলাবী কর্মকর্তারা এবং শিক্ষিত আলাবীরা উক্ত আদর্শের আলোকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের উপায় অনুসন্ধান করে। ১৯৫০ এর দশক থেকে তারা তাদের অবস্থান সংহত করতে থাকে।[৩৯] বা'আস দলের ক্ষমতা দখলের প্রথম

পর্যায়ের এক দশকে (১৯৫৪-৬৬) আলাবী কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। তবে আলাবী রাজনৈতিক প্রাধান্যের বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলো হলো:

ক) লেবাননে আশ্রিত রাজনীতিবিদ-
খ) সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্য -
গ) কিছু বেসামরিক ব্যক্তিত্ব, যারা বিশেষত মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য। কিছু রাজনীতিবিদ বিশেষ করে আরব বা আস' দলের প্রতিষ্ঠাতা মিশেল আফলাকও ঘন ঘন সেনা হস্তক্ষেপের বিরোধী। কিন্তু রাজনীতিবিদদের বিরোধীতা তেমন কার্যকর নয় কেননা সেনাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই।[৪০]

তিউনিসিয়া ও মিসরে সফল গণঅভ্যুত্থানে উদ্বুদ্ধ সিরিয়ার জনগণ গত মার্চ থেকে সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। প্রেসিডেন্ট আসাদও কঠোরভাবে তা মোকাবেলা শুরু করেন। তার নির্দেশে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী সাঁড়াশি অভিযান চালায়। তিউনিসিয়া ও মিসরের গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে সিরিয়ার সরকার বিরোধী বিক্ষোভের পার্থক্য হলো, ওই দেশ দু'টির সেনাবাহিনী জনগণের দাবির সঙ্গে এক হয়েছিল। কিন্তু সিরিয়ায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভ শুরুর ছয় মাস হলেও সেনাবাহিনী এখনো প্রেসিডেন্ট আসাদের অনুগত রয়েছে। এর কারণ সেনাবাহিনীর উপপ্রধানের দায়িত্বে আছেন প্রেসিডেন্ট আসাদের শ্যালক আসেফ শওকত। সেনাবাহিনীর এলিট ফোর্স ফোর্থ ডিভিশনের প্রধান প্রেসিডেন্টের ভাই মাহের। এই বাহিনী সিরীয় জনগণের আতঙ্ক। বিক্ষোভের শুরুর দিকে এই এলিট ফোর্স কঠোর অভিযান শুরু করে।[৪১]

লিবিয়ার মতো সিরিয়াও সাম্রাজ্যবাদের অপছন্দনীয় রাষ্ট্র। সেখানেও স্বৈরশাসন আছে, কিন্তু তিউনিসিয়া, মিশর, ইয়েমেন, বাইরাইন ইত্যাদি যে সব দেশে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে তাদের সঙ্গে লিবিয়ার মতো সিরিয়ারও পার্থক্য। এ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সউদী আরবের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের সমর্থন যোগাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যমে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারনা চলছে। সিরিয়ার অনেক এলাকাতেই সরকার বিরোধী সংগ্রাম হচ্ছে, এই বিদ্রোহীদের উপর সরকার গুলি বর্ষনও করছে। অনেকে হতাহত হচ্ছে। কিন্তু বাশারের অবস্থান বড় রকমভাবে দুর্বল হয়নি। এর কারণ সিরিয়ায় বাশারের বিরুদ্ধে যেমন জনগণের একাংশের ক্ষোভ আছে, তেমনি আছে অন্য অংশের ব্যাপক সমর্থন। কাজেই সিরিয়াতেও তিউনিসিয়া ও মিশরের মতো অবস্থা হচ্ছে না। লিবিয়ার মতো সেখানেও সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ চলছে, যদিও লিবিয়ার মতো দুই পক্ষের যুদ্ধ সেখানে নেই।

লিবিয়ায় হামলা চালালেও পাশ্চাত্য শক্তিজোট ন্যাটোর সিরিয়ার ব্যাপারে উদাসিনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ তারা চায় স্বৈরশাসকের মাধ্যমে গোলান উপত্যকার স্বত্ব ইসরাইলের পক্ষে নিতে। লিবিয়ায় সফলতা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সিরিয়ায় সামরিক অভিযান চালাবে না বলে জানিয়েছে। তারা মনে করে সিরিয়ার সরকার বিরোধীরা তেমন সংগঠিত নয় এবং তারা এক শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠীকে মোকাবেলা করছে যার পশ্চাতে রয়েছে সেনাবাহিনীর সমর্থন। বিশেষজ্ঞদের ধারনা, লিবিয়ায় গাদ্দাফীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ন্যাটোর বিমান হামলায় বিদ্রোহীদের সুবিধে হলেও সিরিয়ায় বিদেশী হস্তক্ষেপ তেমন কার্যকর হবে

না; বরং আরবদের বিরোধীতার মুখে পড়তে পারে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এবং এতে বৃহত্তর আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।[৪২]

অবশ্য আরবলীগভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা চলমান সংকটের সমাধানকল্পে রক্তপাত বন্ধ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণের কথা জানিয়েছেন ২৮/৮/২০১১ তারিখের কায়রো বৈঠকে। আরবলীগ মনে করে সিরিয়ার স্থিতিশীলতা আরববিশ্ব ও পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতার মূল ভিত্তি। ইরানের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন আসাদের উচিত দমন বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। এদিকে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রিসিপ তাইপে এরদুগান সিরীয় প্রেসিডেন্ট আসাদকে এই মর্মে সতর্ক করেন যে, রক্তপাতের মাধ্যমে পরিচালিত শাসন রক্তপাতের মাধ্যমে শেষ হয়। সিরিয়ায় দমন নীতির জন্য আন্ড় র্জাতিক অঙ্গনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সিরীয় সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আরবলীগ প্রধান নাবিল আল-আরাবী ১৩ দফা দাবী নিয়ে ১০.০৯.২০১১ তারিখ শনিবার দামেস্কে প্রেসিডেন্ট আসাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। উপস্থাপিত আরবলীগের প্রস্ড়াবনার মূল বিষয় হচ্ছে:

ক) আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন;
খ) বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা; এবং
গ) দমন-পীড়ন বন্ধ করা।[৪৩]

সরকার বিরোধী বিক্ষোভের কারণে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ চাপের মধ্যে থাকলেও তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ আছেন। সিরিয়ায় ছয় মাস ধরে সরকার বিরোধী চলমান বিক্ষোভ দমনে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আসাদ পরিবার সিরিয়ার সেনাবাহিনী, নিরাপত্তা সংস্থা ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদের জীবনী নিয়ে রচিত 'আসাদ: দ্য স্ট্রাগল ফর দ্য মিডল ইষ্ট' এর লেখক প্যাট্রিক সিল মনে করে আসাদ পরিবার এখনো ঐক্যবদ্ধ। তাঁর মতে যতদিন এই পরিবার ও দেশটির সেনাবাহিনী বা নিরাপত্তা সংস্থা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, ততদিন প্রেসিডেন্ট বাশারকে ক্ষমতা থেকে সরানো কঠিন। লন্ডনে বসবাসরত সাংবাদিক বাসাম জারার মতে আসাদ সরকার এখনো শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন এবং সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বের মধ্যে এখন পর্যন্ড় ফাটল ধরেনি। এই সাংবাদিক এক সময় সাবেক সিরীয় প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আল জুরির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪৪]

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে সাম্রাজ্যবাদীরা সিরিয়ার বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর আহবান জানাচ্ছে বা হুমকি দিচ্ছে। কিন্ড়ু জনগণের গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের গণতন্ত্র যে এক জিনিস নয় বরং পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত, এটা তাদের এই কার্যকলাপ, প্রচার-প্রচারনা ও বিশেষ করে লিবিয়ায় সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমেই বিশ্বের জনগণের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। উত্তর আফ্রিকাসহ গোটা আরব মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য যেভাবে পরিবর্তিত হতে শুর" করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা, তার মুখোমুখি হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা এখন নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অবস্থান পূর্বের মত

ধরে রাখার সম্ভাবনা দিন দিন ক্ষীন হচ্ছে। ইসরায়েলের সাথে তাদের সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হোক, আগামীতে তার ফলাফল কি দাঁড়ায় তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। স্বীয় স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদীরা আগ্রাসন চালিয়ে গেলেও তারা ভীষণভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন। ফলে অনির্দিষ্টকাল আগ্রাসন চালানো যাবে কিনা তাও অনিশ্চিত। মোট কথা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীদের বৈশ্বিক অবস্থান অস্ড়াচলগামী হিসেবে ধরে নেয়া যায়।[৪৫]

উলেণ্খ্য, আগামী ২০১৪ সনে প্রেসিডেন্ট আসাদের মেয়াদ শেষ হবে। তিনি এখনো ক্ষমতা ছাড়ার বিষয়ে কোন ঘোষনা দেন নি, বরং বিদ্রোহীদের স্বীকৃতি না দিতে বহির্বিশ্বের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

৭

আরব বিশ্বের রাজনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারণে ও উত্থান-পতনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা রয়েছে। সেনাবাহিনী আরব বিশ্বের রাজনীতিতে একটি শক্তি। মিশরে সেনাবাহিনীর এই ভূমিকাকে নিশ্চিত করেছিলেন কর্ণেল জামাল আবদুন নাসের। নাসের সেনাবাহিনীর মধ্যে ফ্রি অফিসার্স ক্লাব গঠন করেছিলেন ১৯৪৯ সালে। এই মুক্ত সেনা সংস্থার উদ্যোগেই ১৯৫২ সালে সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। ক্ষমতায় থাকার জন্য সেনাবাহিনীর জেনারেলরা রাজনৈতিক সংগঠনেরও জন্ম দিয়েছেন। ১৯৫৩-৫৬ সালে নাসের গঠন করেছিলেন 'লিবারেশন র‍্যালি'। ১৯৫৭-৭০ সালে গঠিত হয়েছিল 'আরব ইউনিয়ন'। ১৯৭১ সালে সাদাত গঠন করেছিলেন 'আরব সোশ্যালিস্ট ইউনিয়ন'। ১৯৭৯ সালে সাদাত এটাকে ভেঙ্গে গঠন করেছিলেন 'নিউ ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন'। মিশরে একমাত্র 'মুসলিম বাদারহুড' ক্যাডারভিত্তিক পার্টি। নাসের থেকে শুর" করে হোসনি মোবারক সবাই নিজ স্বার্থে দল গঠন করেছেন। এখানে সঠিক অর্থে কোনো রাজনৈতিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে দল গঠিত হয়নি। ক্ষমতায় থাকার জন্যই তারা দল করেছেন। সেখানে সুবিধাবাদীদের ভিড় হয়েছে।

তিউনিসিয়ায় একই ঘটনা দৃশ্যমান। সেনাবাহিনী ও একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীকে কেন্দ্র করে বেন আলি দীর্ঘদিন তার ক্ষমতা ধরে রেখেছিলেন। আলজেরিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বেনবেলণ্ডাকে ১৯৬৫ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে কর্ণেল বুমেদিয়েন উৎখাত করেছিলেন। এরপর ১৯৭৮ সালে তার স্বাভাবিক মৃত্যুর আগ পর্যন্ড় তিনি এককভাবেই দেশটি শাসন করে গেছেন এবং ক্ষমতাকে নিয়মসিদ্ধ করার জন্য তিনি একটি দলও গঠন করেছিলেন। দেশটি একদলীয় শাসনে পরিচালিত হয়েছে দীর্ঘদিন এবং ১৯৮৯ সালে গণভোটে সংবিধানে পরিবর্তন এনে বহুদলীয় রাজনীতির সূচনা হয়। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুতেফ্লিকার ক্ষমতার উৎস ওই সেনাবাহিনী। ১৯৯৯ সাল থেকে তিনি ক্ষমতায় এবং সংবিমান পরিবর্তন করে তৃতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। প্রেসিডেন্টের জন্য তার ভাইকে তিনি প্রস্ড়ুত করছেন। আর লিবিয়ায় কর্ণেল গাদ্দাফী ছিলেন ১৯৬৯ সাল থেকে। তাই দেখা যাচ্ছে, আরব বিশ্বে সেনাবাহিনীই হচ্ছে মূল শক্তি।

৮

২০১১ সনের জানুয়ারী- ফ্রেব্রুয়ারী মাসে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বে ও জন সম্পৃক্ততায় সংঘটিত ঘটনাবলী আরব মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে নতুনমাত্রা সংযোজন করেছে। এ মাত্রা মূলত অভ্যন্তরীণ তবে তার প্রভাব আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিস্তৃত। আরব দেশসমূহে স্বাধীনতার পর থেকে পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা হচ্ছে একনায়কতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক। এর কারণ:

ক) গণতন্ত্রের ঐতিহ্যহীনতা
খ) গোত্রীয় বা বংশীয় শাসনের ধারাবাহিকতা ও পাশ্চাত্যের পৃষ্ঠাপোষকতা।
গ) রাজনীতিতে সেনা হস্তক্ষেপের ফলে দীর্ঘায়িত শাসন ব্যবস্থা যা স্বৈরতান্ত্রিক

স্বভাবতই আরব দেশগুলোতে একনায়কতন্ত্রের দুটো ধারা লক্ষ্যণীয়:

ক) একটি রাজতান্ত্রিক বা পরিবারতান্ত্রিক
খ) অপরটি সেনাতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক

মূলত ধর্মীয় বা গোত্রীয় কারণের পাশাপাশি পাশ্চাত্যশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা রাজতান্ত্রিক শাসনের ধারাবাহিকতাকে স্থিতিশীল করেছে। অন্যান্য আরব দেশগুলো ঔপনিবেশিক আধিপত্য থেকে সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হলেও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচীভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অভাব এবং রাজনীতিবিদদের স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যর্থতা সেনাশাসন দীর্ঘায়িত করার ফলে গণমানষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেনি। অন্যান্য দেশে বংশীয় শাসন একনায়কতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক হওয়ায় নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এ শ্রেণী নানাবিধ পেশাজীবী শ্রেণীতে বিভক্ত। এরা সচেতন এবং তাদের দাবী হচ্ছে:

ক) গণতান্ত্রিকতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা
খ) সেনাশাসন বিরোধী মনোভাব
গ) সার্বজনীন মানবাধিকার সংরক্ষণ

ফলে মানসিকতার এই পরিবর্তন বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। স্বৈরশাসকবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের ইচ্ছার প্রাধান্যে এবং পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবে নিজেদের অবস্থানকে গণমুখী করতে পারেনি। ফলে এই গণ বিস্ফোরণ। গণআন্দোলনের মুখে পতিত দেশগুলোর প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কিন্তু আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

ক) স্বৈরাচারের অবসান ও গণতন্ত্রায়ণ
খ) দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে দীর্ঘদিনের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন
গ) কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পরিবর্তন করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
ঘ) জরুরী অবস্থার অবসান ও বাক স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা
ঙ) সংবিধান সংশোধন করে তা গণমুখী করা

আরব বিশ্বের ভবিষ্যত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন - ক) গণমুখী সরকার খ) গ্রহণযোগ্য নির্বাচন গ) অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির অবসান ঘ) নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রার্থীতাসহ ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ ঙ) স্থিতিশীলতার জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বের নিকট গ্রহণীয় সরকার চ) ফিলিস্তিন সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান ছ) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ জ) পাশ্চাত্য বিশ্বের অযাচিত খবরদারীর অবসান। এগুলো অর্জনে অবশ্য সময়ের প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে দেখুন, সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* (প্রথমখণ্ড) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ৩৭৮-৩৯১; Don Peretz, *The Middle East Today*, 4th Edition (New York: Praeger, 1989), pp. 136-139।

২ হোসেন-ম্যাকমেহন পত্র বিনিময় সম্বন্ধে দেখুন, সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* (প্রথমখণ্ড), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৫-৪০৫।

৩ সাইকস-পিকো চুক্তি সম্বন্ধে দেখুন, *তদেব*, পৃ. ৪০৫-৪১১; Don Peretz, *The Middle East Today*, *op.cit.,* pp. 101-102; S.N Fisher, *The Middle East A History* (London: Routledge & Kegan Paul, 1960), Reprinted 1966, p. 370.

৪ সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* (প্রথমখণ্ড), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫২-৪৭৮।

৫ বদরুদ্দীন উমর, ''মিসরে রাজনৈতিক সঙ্কট'', *আমার দেশ*, বৃহস্পতিবার, ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১১।

৬ সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* (প্রথমখণ্ড), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬।

7 ABM Shahjahan, "Army in Arab Politics", *The Rajshahi University Studies*, (Part-A) Vol. XIX, 1991, p. 55; বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন পৃ. ৫৫-৭৫।

৮ *তদেব*, পৃ. ৬৯-৭০।

৯ *তদেব*, পৃ. ৭১।

১০ বদরুদ্দীন উমর, ''মিসরে রাজনৈতিক সঙ্কট'' *প্রাগুক্ত*।

১১ এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র*, ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১১, পৃ. ২৮৯; S.M. Imamuddin, *A Modern History of the Middle East and North Africa*, Vol. 1 (1258-1939) (Dacca: Najma Sons, 1970), pp. 297-312.

১২ ড. মাহবুব উল্লাহ, ''আরব দুনিয়া: সংশয় ও সম্ভাবনা'', *আমার দেশ*, শনিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১১।

১৩ মুক্তি সেনা সংস্থার গঠন ও কার্যক্রম সম্বন্ধে দেখুন, P.J. Vatikiotis, *The Egyptian Army in Politics Pattern for New Nations?* (Bloomington: Indiana University Press, 1961), pp. 44-68; সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* (দ্বিতীয়খণ্ড), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ৪৭০।

১৪ বিস্তৃত আলোচনার দেখুন, Safiuddin Joarder, "The Camp David Agreements: Genesis and Geopolitics", *The Dhaka University Studies*, Part-A, Vol. 43, No. 1, June 1986, pp. 55-77.

১৫ আব্দুল মান্নান, ''আরব বিশ্বে গণতন্ত্রের পদধ্বনি'', প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১১।

১৬ মাহফুজ উল্লাহ, ''মিসর, শুরু এবং শেষ'', *আমার দেশ*, মঙ্গলবার, ১ ফেব্রুয়ারী, ২০১১।

১৭ ড. তারেক শামসুর রেহমান, ''মিসরে তুরস্ক মডেল'', *আমার দেশ*, রোববার, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১১।

১৮ মাহফুজ উল্লাহ, ''মিসর, শুরু এবং শেষ'', *প্রাগুক্ত*।

১৯ মাহবুব উল্লাহ্, ''আরব দুনিয়া: সংশয় ও সম্ভাবনা'', *প্রাগুক্ত*।

২০ বদরুদ্দীন উমর, ''মিসরে রাজনৈতিক সঙ্কট'', *প্রাগুক্ত*।

২১ S.N Fisher, *The Middle East A History*, *op.cit.,* pp. 568-569; Don Peretz, *The Middle East Today*, *op.cit.*, pp. 490-491; এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র*, পৃ. ৩১৫-৩১৬।

২২ S.N Fisher, *The Middle East A History*, *op.cit.,* pp. 575-576; Don Peretz, *The Middle East Today*, *op.cit.*, pp. 484-487; এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র*, পৃ. ৩১৯-৩২১।

২৩ *প্রথম আলো*, শনিবার, ১ অক্টোবর, ২০১১।

[২৪] *তদেব*।
[২৫] মশিউল আলম, ''লিবিয়া বিপণ্ডব না ঔপনিবেশিক যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি'', *প্রথম আলো*, শনিবার, ৯ এপ্রিল, ২০১১।
[২৬] বদর‍ুদ্দীন উমর, ''লিবিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি'', *আমার দেশ*, রোববার, ৬ মার্চ, ২০১১।
[২৭] মশিউল আলম, ''লিবিয়া বিপণ্ডব না ঔপনিবেশিক যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি'', *প্রাগুক্ত*।
[২৮] *তদেব*।
[২৯] *তদেব*।
[৩০] বদর‍ুদ্দীন উমর, ''লিবিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি'', *প্রাগুক্ত;* প্রথম আলো, ২৫ আগষ্ট, ২০১১।
[৩১] *প্রথম আলো*, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১১
[৩২] *তদেব*।
[৩৩] *তদেব*।
[৩৪] *তদেব*।
[৩৫] *প্রথম আলো*, ৫ অক্টোবর, ২০১১।
[৩৬] *প্রথম আলো*, ২৯ আগষ্ট, ২০১১
[৩৭] Safiuddin Joarder, "Minority in Power : The Dynamics of Comtemporary Syrian Politics", *Society and Culture in Islam* (Chittagong University, Dept. of Islamic History & Culture, October, 1986), p. 32.
[৩৮] *তদেব*, পৃ. ৩৩-৩৫।
[৩৯] *তদেব*।
[৪০] *তদেব*, পৃ. ৪২।
[৪১] *প্রথম আলো*, ২৫ আগষ্ট, ২০১১।
[৪২] *প্রথম আলো*, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১।
[৪৩] *প্রথম আলো*, ২৮ আগষ্ট, ২০১১।
[৪৪] *প্রথম আলো*, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১
[৪৫] বদর‍ুদ্দীন উমর, ''সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও শক্তিশালী হলেও তাদের সূর্য অস্ত্গামী'', *আমার দেশ*, বৃহস্পতিবার, ২৮ জুলাই, ২০১১।